**ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ**

**ছয় দফার সঙ্গে তৈরি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ছকও**

অজয় দাশগুপ্ত

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্ত শাসনের ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। এ কর্মসূচিতে ছিল-পাকিস্তান ফেডারেশনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তন; ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; পূর্ব ও পাশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা চালু কিংবা একক মুদ্রা, তবে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন; সব ধরনের কর ও শুল্কধার্য ও আদয় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে; দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে, অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা থাকবে প্রদেশের হাতে এবং প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে সাবলম্বী করার জন্য নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তর, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন ও আধাসামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন।

তৎকালীন পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্র লাহোরে তিনি যখন এ কর্মসূচি প্রকাশ করেন, প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। বিশেষভাবে রাজস্ব ভাগ বাটোয়ারা ও নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইস্যু প্রধান্য পায়। রাজনৈতিক মহল, সুধী সমাজ, গবেষক, সাংবাদিক এবং উদীয়মান বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি দ্রুতই বুঝে গেল- মুক্তির পথ চিহ্নিত হয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কৌশলেও অন্য সবাইকে বহু যোজন পেছনে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। হরতাল-ধর্মঘট নয়, তিনি কর্মসূচি নিয়ে চলে গেলেন জনগণের কাছে।

পাকিস্তানের শাসকরা বুঝতে পারে, এতদিন যে দাবি নিছক রাজনৈতিক দলের সম্মেলন ও জনসভার প্রস্তাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল- তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। বাঙালিরা হিসেবের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে প্রস্তুত হয়ে উঠছে। দাবি আদায়ে সংগঠন চাই, আন্দোলন চাই এবং তার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের প্রয়োজন পড়বে সে উপলব্ধিও ততদিনে হয়ে গেছে। নেতাও পেয়ে গেছেন তারা। আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে যখন তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, তখন জনগণ এই মহান নেতাকে বরণ করে নেয় বঙ্গবন্ধু হিসেবে।

নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা অবশ্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সামনে আনেন। বয়স যখন মাত্র ২৯ বছর- আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক- ১৯৪৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আরমানিটোলা ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেছিলেন, ‘পাঞ্জাবি সৈন্যরা পূর্ব বাংলার ভৌগলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নয়। আমাদের দেশের নিরাপত্তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।’

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি যে সংগঠনের জন্ম দেন, সেই ছাত্রলীগ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নেওয়ার জন্যই আয়োজন হয়েছিল সম্মেলনের। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্মেলন ও জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান প্রাপ্তবয়স্ক সকল ব্যক্তিকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান এং প্রয়োজন পড়লে দেশ রক্ষার জন্য তাদের অস্ত্র সরবরাহের দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধু এটাও জানা হয়ে গেছে, বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধ শক্তি প্রবল ক্ষমতাধর এবং তাকেই আঘাতের টার্গেট করবে। ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও বাদ যাবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের সময়ে বলেছিলেন, ‘আমি যদি হুকুম দেবার না পারি...’- অবাক বিস্ময়ে আমরা দেখি, এ ঐতিহাসিক দিনের পাঁচ বছর আগে ছয় দফা প্রদানের পরপরই তিনি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন- মুক্ত জীবনে তাকে রাখা হবে না। সচেতন প্রয়াসে এমন অবস্থা তৈরি করতে পারেন যেন আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে না যায়। জনগণকে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তরুণ সমাজ এগিয়ে এসেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ের মতো সাহস ও সংকল্প নিয়ে। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। আদমজী-ডেমরা-টঙ্গী-তেজগাঁয়ের শ্রমিকরা আন্দোলনে সক্রিয় হচ্ছে। ‘বাংলাদেশ’ দৃষ্টি সীমানায় এসে পড়েছে। ‘স্বাধীনতা’ নিষিদ্ধ শব্দ। কিন্তু অনেকেই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠছেন-পিন্ডি বা লাহোর নয়, ঢাকাতেই এ ভূখণ্ডের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রদানের পর আওয়ামীলীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং তাঁর দুষ্কর্মের সহযোগী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান একের পর এক দুরভিসন্ধি আঁটেন। কিন্তু বাঙালিরা অবাক বিস্ময়ে দেখল, দলের সভাপতি ও অন্যান্য নেতা গ্রেফতার হওয়ার এক মাসপূর্ণ হওয়ার আগেই গোটা পূর্ব পাকিস্তানে যারা হরতাল আহ্বান করেছিল, তাদের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটির শীর্ষ স্থানীয় কোনো নেতাই ছিলেন না।

‘কারাগারের রোজ নামচা’ গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক তারিখে (৭ জুন, ১৯৬৬। মঙ্গলবার) শেখ মুজিবুর রহমান দিনলিপি বা ডায়েরি শুরু করেছেন এভাবে- ‘সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কি হয় আজ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকান-পাট, গাড়ি, বাস, রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলেছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামীলীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ

-২-

পাইলাম পুলিশ আনছার দিয়া ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। ...আবার খবর এল টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠিচার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিরা কয়েদিদের বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। ...জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচবার দাবি তারা চায়-এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যেই হয়ে গেল।’

ছয় দফা প্রদানের পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ঘনিষ্ঠজনদের কাছে বলছিলেন, ছয় দফা মানলে ভাল। না মানলে এক দফা। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য যে স্বাধীনতা এবং এ জন্য ধাপে ধাপে কুশলী পদক্ষেপ নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন- সেটা গোপন করেননি কখনও।

এক দফার আন্দোলন যখন সামনে এলো, তিনি দীর্ঘ দুই যুগের সাধনায় যা কিছু তৈরি করেছেন, একে সব কাজে লেগে গেল- জনগণপ্রস্তুত, সংগঠিত ছাত্র-তরুণরা। দেশব্যাপী নিষ্ঠুর গণহত্যার মধ্যেই ২৫ মার্চের দুই সপ্তাহ যেতে না যেতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন ও সক্রিয় কার্যক্রম শুরু করতে পারা গোটা বিশ্বকেই বিস্মিত করে। আর কী অনন্য দূরদর্শিতা- ১৯৪৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দাবি তুলেছিলেন প্রাপ্ত বয়স্কদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করার। সেটা পাকিস্তানের শাসকরা করেনি। বাংলাদেশের লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়ে ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে তাড়াতে। ২৬ মার্চ এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল পর্ব আমাদের যে সব রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়- এক, সঠিক সময়ে সঠিক কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন। দুই, উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি। তিন, জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামীলীগ এটা করতে পেরেছিল বলেই ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের হরতালে অভাবনীয় সাড়া মিলেছিল, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে বিপুল আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি চালানোর পর্যায়েই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ছক তৈরি করে ফেলেছিলেন। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রসহ কতিপয় ধনবান দেশ ও বিশ্বব্যাংক যে নতুন রাষ্ট্রকে ‘বাস্কেট কেস’ হিসেবে উপহাস করেছিল, স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সে দেশটিই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে পারে।

আবার ২১ বছরের দুঃশাসনের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিয়ে যে দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে তুলে দিতে অনন্য সফলতা দেখাতে পারে তারও প্রেরণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ ভূখণ্ড এবং তার মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা রাখার কারণেই বাংলাদেশে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে বহুবিধ বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। তলাবিহীন ঝুঁড়ির বদনাম ঘুচিয়ে দেশটিকে খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা, কুচক্রি মহলের কারণে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থ জোগানো বন্ধ করে দেওয়ার পর নিজস্ব অর্থে যোগাযোগ খাতের এ সুবৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গর্বিত পদচারণা, প্রায় ছয় কোটি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসতে পারা- বাংলাদেশের এ ধরনের আরও উজ্জ্বল উদাহরণ এখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দই দিচ্ছেন। করোনাত্তোরকালে বাংলাদেশ যে উন্নয়নের সঠিক ও টেকসই ধারায় চলতে পারবে, সে ভরসাও কিন্তু আমরা পেয়ে যাই বঙ্গবন্ধু কন্যার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী কর্মসূচি ও কর্মকৌশলের কারণে। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি দৃঢ় সংকল্পে করে ফেলা- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ধারণ করেন।

#

০৩.০৬.২০২০ পিআইডি ফিচার